OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 231 - 236
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 231 - 236
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

স্টানজেলের কথনরীতি ও বাংলা উপন্যাস

ড. আনিসুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: anisurrahaman1988@gmail.com
0009-0008-3758-4253

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Narrative representation, Prerogative, Narrative voice, Discourse, Omniscient, Interpreting, The complex dynamics of human relationships, Ever-evolving society.

Abstract

One of the key parameters in the study of narrative theory is the mode of narration. In the context of narrative representation[1], the specific process by which a story is narrated, termed as 'Narratology'. Within a narrative account, the narrator possesses the prerogative to evaluate specific events or characters. Indeed, the literary narrative itself is constructed through the narrative voice and discourse of this narrator. Based on the extent of the narrator's participation in the story. Theorists have identified various modes of narration—namely.

First-person narrative situation, Authorial narrative situation and Figural narrative situation.

In the first-person narrative mode, the narrator is present within the narrative as an active participant and storyteller. Omniscient narration constitutes a powerful narrative technique within the literary landscape, wherein the narrator—despite not being a visible character within the story—exercises control over the entire narrative world. Conversely, the figural narrative mode typically employs the first-person perspective. Needless to say, this theoretical framework serves not only to facilitate an understanding of the formal aspects of the novel but also aids in comprehending and interpreting[6] the complex dynamics of human relationships within an ever-evolving society.

Discussion

শিল্প মাত্রই একটি নির্দিষ্ট মাধ্যম সাপেক্ষ এবং কোনো-না-কোনো সংরূপ বা প্রস্থানকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সংরূপ নির্মাণের বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। কারণ এর বুনন মাধ্যমটি হল ভাষা। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করেন, একজন লেখকের সার্থকতা কেবল শব্দচয়নের ওপর নির্ভর করে না, বরং তার বর্ণনাগত পারঙ্গমতাবোধের ওপর নির্ভর করে। এই পারঙ্গমতাবোধ হল ভাষার এমন এক সৃজনশীল প্রয়োগপ্রক্রিয়া, যা কেবল তথ্যপরিবেশন করে না। বরং একটি নিটোল শিল্পরূপ গড়ে তোলে। যখন একজন লেখক কোনো বিশেষ সংরূপ— যেমন উপন্যাস, ছোটগল্প বা নাটক নির্মাণ করেন, তখন তাকে সেই সংরূপের নিজস্ব ব্যাকরণ মাথায় রেখে কথনশৈলী সাজাতে হয়। আধুনিক ভাষাতত্ত্বের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, লেখকের এই বর্ণনা করার ক্ষমতাই নির্ধারণ করে দেয় পাঠক সেই সৃষ্টিকে কীভাবে গ্রহণ করবেন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 231 - 236
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বর্ণনাগত পারঙ্গমতাবোধের এই প্রেক্ষাপটেই উঠে আসে গল্প বলা বা কাহিনি উপস্থাপনের বিভিন্ন রীতির কথা। কোনো একটি কাহিনিকে উপস্থাপন করার ভঙ্গিই হল সেই শিল্পের প্রাণ। এখানে 'কী বলা হচ্ছে' তার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে 'কীভাবে বলা হচ্ছে'। নারেটোলজি অনুযায়ী এই উপস্থাপনের রীতির মধ্যেই লেখকের শৈল্পিক মুনশিয়ানা লুকিয়ে থাকে।

আখ্যানের প্রতিবেদনে কাহিনি যেভাবে বর্ণিত হয় সেই বিশেষ প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিকেই সাহিত্যতত্ত্বের পরিভাষায় 'কথন' বা 'Narration' বলা হয়। কোনো একটি ঘটনা যখন নিছক তথ্য হিসেবে পরিবেশিত না হয়ে একটি নির্দিষ্ট শৈল্পিক কাঠামোতে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত হয়, তখনই তা আখ্যানে রূপ নেয়। এই রূপান্তরের কারিগরি মুনশিয়ানাই হল কথনরীতি। একটি সার্থক আখ্যান কেবল কী বলা হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে না, বরং কীভাবে বলা হচ্ছে—তার ওপরেই এর সাহিত্যগুণ বিচার করা হয়। এই 'বলা'র ভঙ্গিটিই স্থির করে দেয় গল্পের মেজাজ, গতি এবং গভীরতা। আখ্যানের প্রতিবেদনে কথকের আছে কোনো ঘটনা বা চরিত্র সম্পর্কে মূল্যায়নের অধিকার। আর এই কথকের সংলাপেই সমগ্র কথন অংশটি নির্মিত হয়ে থাকে। কথকের কাহিনিতে অংশগ্রহণের ওপর ভিত্তি করে F. K Stanzel তাঁর 'A Theory of Narrative' গ্রন্থে তিনপ্রকার কথনরীতির কথা বলেছেন। যথা—

- আত্মকথন (First person narrative situation)
- সর্বজ্ঞকথন (Authorial narrative situation)
- চরিত্রানুগকথন (Figural narrative situation)[১]

আত্মকথন (First person narrative situation) : যখন কোনো কাহিনির বর্ণনাকারী বা কথক নিজেই সেই আখ্যানের একজন সক্রিয় চরিত্র হিসেবে উপস্থিত থাকেন এবং নিজের জবানিতে সম্পূর্ণ ঘটনাটি বর্ণনা করেন তখন তাকে আত্মকথনরীতি বলা হয়। এখানে কথক কেবল একজন বক্তা নন, বরং তিনি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে নিজের আবেগ, পর্যবেক্ষণ এবং সীমাবদ্ধতাকে সঙ্গী করে কাহিনিটি এগিয়ে নিয়ে যান। এই বিশেষ পদ্ধতির ফলে পাঠকের সঙ্গে বর্ণনাকারীর একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কারণ পাঠক সরাসরি সেই চরিত্রের মনস্তত্ত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যদিয়ে পুরো জগতটিকে দেখতে পান। এক্ষেত্রে কথক হতে পারে প্রতিবেদনের কোনো প্রধান কিংবা গৌণ চরিত্র। এক কথায়, আত্মকথনরীতিতে উত্তম পুরুষে প্রতিবেদনের ঘটনা বর্ণনা করা হয়। আত্মকথনরীতির একটি বিশেষ সুবিধা হল এই রীতির কথক পাঠকের সঙ্গে বিশ্বাসের অনুভূতি তৈরি করতে পারে, সহানুভূতি জাগিয়ে তাঁদের গল্পে টানতে পারে যা প্রতিবেদনের নায়ক-নায়িকা এবং তাঁদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম সম্পর্কে আরও যত্নবান করে তোলে। এই রীতিকে গঠনের দিক থেকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা, একক রীতি, যৌগিক রীতি এবং মিশ্র রীতি।

আত্মকথনের 'একক রীতি' মূলত সাহিত্যের এমন এক প্রকাশভঙ্গি যেখানে সমগ্র কাহিনির ভার একজন কথকের ওপর ন্যস্ত থাকে। এখানে কথক কেবল পর্দার আড়ালে থাকা কোনো বর্ণনাকারী নন, বরং তিনি গল্পের ভেতরেই অবস্থান করেন। এই রীতিতে কথক যখন নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির কথা ব্যক্ত করেন তখন তিনি গল্পের কেন্দ্রীয় বা মুখ্য চরিত্রে পরিণত হন। বাংলা সাহিত্যে এই রীতির আত্মকথনধর্মী উপন্যাসগুলি হল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ইন্দিরা' (১৮৭৩), তারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অদৃষ্ট' (১৮৯২), স্বর্ণকুমারী দেবীর 'কাহাকে' (১৮৯৮), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চতুরঙ্গ' (১৯১৫), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত' (১৯১৭, ১৯১৮, ১৯২৭), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দৃষ্টিপ্রদীপ' (১৯৩৫), 'আরণ্যক' (১৯৩৯), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছন্দপতন' (১৯৫১), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আগুন' (১৯৬২), বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'নিলাঙ্গুরীয়' (১৯৪২), 'কুশীপ্রাঙ্গণের চিঠি' (১৯৫৩), বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'রাত্রি', বুদ্ধদেব বসুর 'সানন্দা' (১৯৩৩), 'আমার বন্ধু' (১৯৩৩), 'নীলাঞ্জনের খাতা' (১৯৬০), সন্তোষকুমার ঘোষের 'শেষ নমস্কার-শ্রীচরণেষু মাকে' (১৯৭১), সৈয়দ মুজতবা আলীর 'শবনম' (১৯৬৯), 'শহ্‌র-ইয়ার' (১৯৬৯) ইত্যাদি। উদাহরণ হিসেবে আমরা সৈয়দ মুজতবা আলীর 'শহ্‌র-ইয়ার' উপন্যাস থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরছি, যেখানে সমগ্র প্রতিবেদনের কথক মাত্র একজন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেদনের অন্যতম চরিত্রও, -

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 231 - 236
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "যৌবনে আমার মাথায় ছিল কাঁথার মত চুল। সেলুনের তো কথাই নেই, গাঁয়ের নাপতে পর্যন্ত ছাঁটতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যেত। কাজেই সমস্ত অপারেশনটা এমনই দীর্ঘস্থায়ী আর একঘেঁয়ে লাগতো যে আমি ঘুমের বড়ি খেয়ে নিয়ে সেলুনে ঢুকতুম। চুলকাটা শেষ হলে পর সেলুনের নাপতে ধাক্কাধাক্কি করে ঘুম ভাঙিয়ে দিত। সেদিনও হয়েছে তাই। কিন্তু ইয়াল্লা, আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখি চুলের যা বাহারে 'কট' নিয়েছে সে নিয়ে চিতাশয্যায় পর্যন্ত ওঠা যায় না, ডোম পোড়াতে রাজী হবে না। কিন্তু তখন আর কিছু করার নেই। মেঘে মেঘে বেলা হয়ে গিয়েছে। মহা বিরক্তি আর উষ্মা গোস্‌সাসহ রাস্তায় নাবলুম।"[২]

'যৌগিক রীতি' হল আত্মকথনের সেই রীতি যেখানে একাধিক কথকের উপস্থিতি আখ্যানের প্রতিবেদনে লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ সমগ্র প্রতিবেদনটি একাধিক কথকের দ্বারা বর্ণিত হয়। এই রীতিকে আবার গঠনের দিক থেকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা, সমবায়িক এবং বিগর্ভিত। সমবায়িক আত্মকথনধর্মী উপন্যাসের প্রতিবেদনে দুই কিংবা তার অধিক কথকের বাচন থাকে ক্রমপর্যায়ে। যেমনটি আমরা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যোগভ্রষ্ট' (১৯৬১) উপন্যাসে লক্ষ করি। 'যোগভ্রষ্ট' উপন্যাসটি নির্মিত হয়েছে দুজন কথকের অর্থাৎ শিবনাথ ও সুদর্শনের আত্মসমীক্ষাকে অবলম্বন করে। আবার সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' (১৯৪৫) উপন্যাসটি নির্মিত হয়েছে চারজন কথকের আত্মসমীক্ষাকে অবলম্বন করে। এ ছাড়া, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রজনী' (১৯৭৭), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬), বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'লক্ষ্মীর আগমন' (১৯৫৪), বিমল করের 'অসময়' (১৯৬৫) ইত্যাদি উপন্যাস আত্মকথনের সমবায়িক রীতিতে রচিত। আর বিগর্ভিত রীতির আত্মকথনে একজন কথক আখ্যানের প্রতিবেদনের কোনো চরিত্রের আত্মকথনকে ব্যবহার করে থাকে। এই রীতি তুলনামূলকভাবে খুবই জটিল। সাধারণত গৌণ কোনো চরিত্র কাহিনীকথনের দায়িত্ব নিলে বিগর্ভিত আত্মকথন রীতির উদ্ভব ঘটে। সেক্ষেত্রে বিশেষত মুখ্য চরিত্রটির অন্তঃপ্রেক্ষিত ব্যবহারের তাগিদে তাঁর আত্মকথন ব্যবহার করে আখ্যানের মূল কথক।[৩] বাংলা সাহিত্যে এই রীতিতে রচিত উপন্যাসের সংখ্যা খুবই কম। বনফুল ওরফে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় তাঁর বেশ কয়েকটি উপন্যাসে যেমন 'অগ্নীশ্বর', 'জলতরঙ্গ'-এ আত্মকথনের বিগর্ভিত রীতিতে কাহিনি বর্ণনা করেছেন। 'অগ্নীশ্বর' উপন্যাসের নায়ক অগ্নীশ্বরের আত্মকথনকে সচেতনভাবে ব্যবহার করেছে অন্য একটি গৌণ চরিত্র খগেন। মিশ্রকথনরীতি হল সেই রীতি যখন অন্য কথন পরিস্থিতি আত্মকথনরীতির মধ্যে বিগর্ভিত হয়।[৪] উদাহরণ হিসেবে আমরা বনফুলের 'কিছুক্ষণ' উপন্যাসের কথা বলতে পারি, যেখানে মূল কাহিনি কথকের কথনের মধ্যে অন্যান্য চরিত্রদের কথন মিশ্রিত হয়ে মিশ্র কথনরীতির সৃষ্টি হয়েছে।

আত্মকথনরীতিতে নির্মিত উপন্যাসের অন্তর্নিহিত পর্যালোচনার প্রথমেই 'আরণ্যক' উপন্যাসের কথায় আসা যাক। 'আরণ্যক' উপন্যাসটির সূচনাংশ আত্মকথনের একক রীতিতে রচিত। যেমন, -

> "পনের-ষোল বছর আগেকার কথা। বি. এ. পাস করিয়া কলিকাতায় বসিয়া আছি। বহু জায়গায় ঘুরিয়াও চাকুরী মিলিল না।
>
> সরস্বতী-পূজার দিন। মেসে অনেকদিন ধরিয়া আছি তাই নিতান্ত তাড়াইয়া দেয় না, কিন্তু তাগাদার উপর তাগাদা দিয়া মেসের ম্যানেজার অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। মেসে প্রতিমা গড়াইয়া পূজা হইতেছে ধুমধামও মন্দ নয়, সকালে উঠিয়া ভাবিতেছি আজ সব. বন্ধ, দু-একটা জায়গায় একটু আশা দিয়াছিল, তা আজ আর কোথাও যাওয়া কোন কাজের হইবে না, বরং তার চেয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঠাকুর দেখিয়া বেড়াই।"[৫]

কিন্তু পরবর্তীতে মূল কাহিনিকথক সত্যচরণের কথনের মধ্যে অন্য চরিত্রদের কথন বিগর্ভিত হয়ে আলোচ্য উপন্যাসের প্রতিবেদনে বিগর্ভিত মিশ্র আত্মকথনরীতির প্রয়োগ ঘটেছে। যেমন, -

> "রাত্রিতে নিজের ঘরে বসিয়া এই সবই ভাবিতেছি, এমন সময় ঘরের দরজা ঠেলিয়া কাছারির বৃদ্ধ মুহুরী গোষ্ঠ চক্রবর্তী প্রবেশ করিলেন। এই একমাত্র লোক যাহার সহিত বাংলা কথা বলিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি। গোষ্ঠবাবু এখানে আছেন অন্তত সতের-আঠার বছর। বর্তমান জেলায় বনপাশ স্টেশনের কাছে কোন্ গ্রামে বাড়ী। বলিলাম, বসুন গোষ্ঠবাবু- গোষ্ঠবাবু অন্য একখানা চেয়ারে বসিলেন। বলিলেন-

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 231 - 236
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> আপনাকে একটা কথা বলতে এলাম নিরিবিলি, এখানকার কোনও মানুষকে বিশ্বাস করবেন না। এ বাংলা দেশ নয়। লোকজন সব বড় খারাপ।"[৬]

এইভাবে পরপর গোষ্ঠবাবু, পাটোয়ারী, গনোরী তেওয়ারী, নন্দলাল, ভানুমতী প্রমুখ চরিত্রের কথন মূল কাহিনির কথন সত্যচরণের কথনের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। ফলে আত্মকথনের একক রীতির মধ্যে অন্য চরিত্রদের কথন মিশ্রিত হয়ে 'আরণ্যক' উপন্যাসটি মিশ্র আত্মকথনরীতির দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে।

ঠিক একই কথা প্রযোজ্য অনিল ঘড়াই-এর 'বক্ররেখা' উপন্যাসটির ক্ষেত্রেও। আলোচ্য উপন্যাসটিরও সূচনাংশ আত্মকথনের একক রীতিতে রচিত, -

> "মেস ছাড়িয়ে কিছুদূরে আসতেই ঠান্ডাটা খুব জোর লাগে, দাঁতে দাঁত চেপে কেঁপে উঠি আমি। গতকালের বাংলা কাগজে পড়েছিলাম-বঙ্গোপসাগরীয় নিম্নচাপ, শৈত্য প্রবাহ মাঝে মাঝে জ্বালাবে।"[৭]

কিন্তু যেই কাহিনি একটু অগ্রসর হয়েছে অমনি মাখনের কথনের মধ্যে বটুর কথন বিগর্ভিত হয়ে পড়েছে, -

> "বটু উত্তর না দিয়ে ক্লান্ত চোখ মেলে আমার দিকে তাকায়। আমি যখন জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা বটু, তোমার মা-বাবা এখন কোথায় থাকে? আমার এই প্রশ্ন যেন বটুর মুখের সমস্ত রক্ত শুষে নেয়। তখন সে ভারাক্রান্ত গলায় জবাব দেয়, আমার কেউ নেই মাখনদাদা। এ দুনিয়ায় আমি একা।"[৮]

ঠিক এইভাবে কখনও পরিমল, কখনও লাটু, কখনও সীতা, কখনও হাসান মাস্টার, কখনও জালাল, কখনও সুখিয়া, কখনও বনমালী, কখনও শকুন্তলা, কখনও রবার্ট, কখনও চন্দনা, কখনও সুজিত চরিত্রের কথন বিগর্ভিত হয়ে 'বক্ররেখা' উপন্যাসটিও বিগর্ভিত মিশ্র আত্মকথনরীতির দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে।

আসলে ঔপন্যাসিকেরা বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই আত্মকথনের একক রীতিতে তাঁদের উপন্যাস নির্মাণ করে থাকেন। যেমন, -

> "সময় ও সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে মানুষ ক্রমশই কেমন নিঃসঙ্গ তথা বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, তাদের চেতনায় কেমন সংকীর্ণতা দেখা দিচ্ছে, খুব কাছের সম্পর্কে, রক্তের সম্পর্কে কেমন ভাঙন দেখা দিচ্ছে-সেই প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত স্মৃতি-স্বপ্নের বিনষ্টিকে লক্ষ করেছেন একালের শিল্পীরাও।"[৯]

সময়ের দহনে মানুষের মানসিক যন্ত্রণা ও বিচ্ছিন্নতা, রক্তের সম্পর্কের অবনমনকে রূপ দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিকরা আত্মকথনরীতি বেছে নেন।

তা ছাড়া, আমরা সকলেই অবগত যে, আত্মকথনরীতির উপন্যাসে কথক অনেক সময় নিজেকে অন্তরালে রেখে দ্রষ্টার মতো কাহিনি বর্ণনা করে যান। আর ঠিক তখনই প্রতিবেদনের অন্যান্য চরিত্রগুলি আরও বেশি উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত এবং সজীব হয়ে ওঠে।[১০] উদাহরণস্বরূপ আমরা যদি অনিল ঘড়াই-এর 'বক্ররেখা' উপন্যাসের কথা বলি তাহলে দেখব যে, সমগ্র প্রতিবেদনের কথক মাখন নিজেকে যতটা পেরেছে প্রচ্ছন্ন রেখেছে। আর তারই ফলে উপন্যাসের প্রতিবেদনে মাখনের পাশাপাশি যেসব চরিত্র আছে, যেমন - বটু, সীতা, শকুন্তলা, চন্দনা, বনমালী প্রমুখ নিজেদের উন্মোচিত করে আমাদের সামনে নিজেকে মেলে ধরেছে। ঠিক একই কথা প্রযোজ্য বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসের ক্ষেত্রেও। সেখানেও আমরা দেখি যে, প্রতিবেদনের কথক চরিত্র সত্যচরণ নিজেকে অন্তরালে রেখেছে। শুধু তাই নয়, যখনই নিজেকে আমাদের দৃষ্টির গোচরে নিয়ে এসেছেন তখন তিনি নিজেকে যতটা না উন্মোচিত করেছেন তার বেশি উন্মোচিত হয়েছে প্রতিবেদনের অন্যান্য চরিত্রগুলি তার সংস্পর্শে এসে।

সর্বজ্ঞকথন (Authorial narrative situation) : সাহিত্যের আঙিনায় সর্বজ্ঞকথন হল এমন একটি শক্তিশালী বর্ণনাকৌশল যেখানে কথক গল্পের কোনো দৃশ্যমান চরিত্র না হয়েও সমগ্র কাহিনিবিশ্বের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও জ্ঞান রাখেন। এখানে কথক কোনো নির্দিষ্ট চরিত্রের সীমাবদ্ধতায় আটকে থাকেন না, বরং তিনি অনেকটা অদৃশ্য দেবতার মতো উচ্চতর কোনো অবস্থান থেকে প্রতিটি ঘটনার গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করেন। এই পদ্ধতিতে কথকের ক্ষমতা অসীম; তিনি যেমন চরিত্রের বাহ্যিক কার্যকলাপ বর্ণনা করেন তেমনই অতি অনায়াসে প্রবেশ করতে পারেন তাদের অবচেতন মনের গহীনে,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 231 - 236
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

যেখানে লুকিয়ে থাকে অব্যক্ত যন্ত্রণা, গোপন বাসনা কিংবা জটিল কোনো ষড়যন্ত্র। যেহেতু তিনি কাহিনির কোনো অংশ নন, তাই তার বর্ণনায় একধরনের নৈর্ব্যক্তিকতা ও নিরপেক্ষতা থাকে, যা পাঠককে কাহিনির প্রতিটি বাঁক এবং চরিত্রের জীবনের গভীরতর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বুঝতে সাহায্য করে। সর্বজ্ঞ কথনরীতিতেও সাধারণত প্রথম পুরুষে সমগ্র কাহিনি বর্ণনা করা হয়। এই রীতির উপন্যাসগুলি হল বনফুলের 'ডানা' (১৯৪৮-৫৫), মহাশ্বেতা দেবীর 'বায়োস্কোপের বাক্স' (১৯৬৪), 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু' (১৯৬৭), 'টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা' (১৯৮৯), অমর মিত্রের 'ধ্রুবপুত্র' (২০০২), সুধীর চক্রবর্তীর 'নির্বাস' (২০১৭), কল্লোল লাহিড়ীর 'ইন্দুবালা ভাতের হোটেল' (২০২০) ইত্যাদি। বনফুলের 'ডানা' উপন্যাস থেকে আমরা এই সর্বজ্ঞকথন রীতির দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পারি, -

> "কবি ও বৈজ্ঞানিক বেরিয়েছেন পরিভ্রমণ করতে, সঙ্গে আছেন বন্ধু রূপচাঁদ মৌলিক। রূপচাঁদ কবিও নন, বৈজ্ঞানিকও নন, অথচ উভয় জগতেই গতিবিধি আছে কিঞ্চিৎ।"[১১]

ঔপন্যাসিক মূলত কয়েকটি কারণে তাঁর উপন্যাস সর্বজ্ঞ-কথনরীতিতে নির্মাণ করেন। এই কথনরীতিতে ঔপন্যাসিক অনেক সময় আকর্ষণবোধ করেন ব্যক্তিজীবনের নিজস্ব ভাঙাগড়ার থেকে গ্রামীণ জনজীবনের নিখুঁত চিত্রাঙ্কনের প্রতি। গ্রাম-বাংলার অন্তেবাসী মানুষ এবং তাদের সংগ্রামী চেতনাকে উপলব্ধি করেন বলেই তিনি সর্বজ্ঞকথনরীতির আশ্রয় নেন। আবার অনেক সময় আমাদের সমাজ-রাষ্ট্র রাজনৈতিক ঘটনাবর্তে এতটাই উত্তাল হয়ে পড়ে যে, ব্যক্তির নিজস্ব চাওয়া-পাওয়া, অভাব-অভিযোগ সেখানে কিছুটা গৌণ হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক বৈষম্য এতটাই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে যে, স্বল্পপুঁজিতে কীভাবে নিজের পরিবারকে টিকিয়ে রাখা যায় তা-ই জনজীবনের ধ্যান-জ্ঞান হয়ে ওঠে। এহেন অবস্থায় ঔপন্যাসিক হয়ে ওঠেন রিপোর্টারের মতো ঘটনাবিবরণকারী। অর্থনৈতিক সংকটের অন্ধ গলিপথে যাঁদের চলতে হয়েছে কিংবা যেসমস্ত কথাকোবিদ সেই সমাজেরই একজন তাঁদের ক্ষেত্রে এ কথাটি আরও গভীরভাবে সত্য। তাই এধরনের উপন্যাসের আখ্যানবিশ্বে সর্বজ্ঞকথনরীতির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। তা ছাড়া, ঔপন্যাসিক যখন তাঁর উপন্যাসের কথনবিশ্বে নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চলের জনজীবনকে ধরতে চান তখন সর্বজ্ঞকথনরীতির আশ্রয় নেন। কেননা, শোয়িং (showing) এবং টেলিং (telling) সর্বজ্ঞকথনরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আঞ্চলিক উপন্যাসকারকে যেহেতু প্রতিবেদনে স্থাপিত অঞ্চলটিকে প্রাণবন্তরূপে ফুটিয়ে তোলার দিকে লক্ষ রাখতে হয়, তাই এক্ষেত্রে চরিত্রসমূহের চাওয়া-পাওয়া কিছুটা গৌণ হয়ে পড়ে। চরিত্রসমূহ সেই অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করে অঞ্চলটিকে প্রাণবন্ত রূপ দান করেন।

চরিত্রানুগ বা ভূমিকানুগ কথন (Figural narrative situation) : চরিত্রানুগ কথন রীতির ক্ষেত্রে সাধারণত প্রথম পুরুষের বচন হয়। এক্ষেত্রে নির্দিষ্টভাবে কোনও কথকের কথা বলেননি জেনেট। বরং মধ্যস্থতা বা সাপেক্ষতার বদলে প্রত্যক্ষ সংযোগের কথা বলতে গিয়ে 'রিফ্লেক্টর' (reflector) পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন। এই রিফ্লেক্টর বা প্রতিফলক আসলে প্রতিবেদনের একজন চরিত্র; যার প্রত্যক্ষণ রয়েছে, কিন্তু কথকের মতো পাঠকের উদ্দেশে কিছু বলতে পারে না। একজন পাঠক এখানে প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ করে ওই প্রতিফলক চরিত্রের (reflector-character) চোখ দিয়ে। এরকম পরিস্থিতিতে কেউ আর কাহিনি বলছে না, উপস্থাপন একেবারে সরাসরি।[১২] এজন্য Stanzel বলেছেন যে, -

> "Since nobody 'narrates' in this case, the presentation seems to be direct."[১৩]

ভগীরথ মিশ্রের 'আড়কাঠি' উপন্যাসের প্রতিবেদনে আমরা এই রীতির প্রয়োগ হতে দেখি। এখানে আমরা একটি বিপদগ্রস্ত হনুমানকে পর্যবেক্ষণ করি রাজীবের চোখ দিয়ে, -

> "রাজীব দেখে, মৃত্যুভয় ফুটে উঠেছে হনুমানটির চোখে-মুখে। সারা শরীর ঠক ঠক করে কাঁপছে। তেঁতুলের ঘন ডালপালার আড়ালে শরীরখানি লুকিয়ে ফেলবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে প্রাণীটি। ঘাড় ঘুড়িয়ে বার বার দেখে নিচ্ছে চারপাশে, কোন্ দিক থেকে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে মৃত্যু, অথবা বাঁচবার পথ কোনোদিকে খোলা রয়েছে কিনা।"[১৪]

এভাবেই F. K. Stanzel তাঁর 'A Theory of Narrative' গ্রন্থে লেখকের কাহিনিতে অংশগ্রহণের ওপর ভিত্তি করে কথনরীতিকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন এবং তাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের জায়গাগুলি চিহ্নিত করেছেন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 31
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 231 - 236
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কথনতাত্ত্বিক F. K Stanzel তাঁর 'A Theory of Narrative' গ্রন্থে যে তিনপ্রকার কথনরীতির বৈচিত্র্যের কথা বলেছেন তা আমরা বাংলা উপন্যাসকে সামনে রেখে আলোচনা করে দেখলাম যে, এই কথনরীতি নিছক কথনরীতি নয়, এখানে আছে লেখকের নানান উদ্দেশ্যের প্রতিফলন। সুতরাং, শিল্পের কথনরীতি কেবলমাত্র উপন্যাসের গঠনকৌশলকেই বুঝতে সাহায্য করে না, লেখকের তথা সমকালীন সমাজজীবনের নানান দিকেরও প্রতিফলন ঘটে এই কথনতত্ত্বের বৈচিত্র্যের মধ্যে। স্টানজেলের তাত্ত্বিক কাঠামোটি কেবলমাত্র উপন্যাসের আঙ্গিকগত দিক বুঝতে সাহায্য করে না, বরং তা সাহিত্যের আয়নায় সমাজ ও মানুষের পরিবর্তনশীল সম্পর্কের রসায়নকেও সার্থকভাবে ব্যাখ্যা করে। লেখকের গভীর জীবনবোধ ও উদ্দেশ্যের প্রতিফলনই শেষ পর্যন্ত কথনরীতির এই বৈচিত্র্যকে পূর্ণতা দান করে।

Reference:

১. দাস, অমিতাভ, *আখ্যানতত্ত্ব,* দে'জ পাবলিশিং, ২০১২, পৃ. ৭০-৭১
২. মুজতবা আলী, সৈয়দ, *শহর-ইয়ার, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড),* মিত্র ও ঘোষ, ১৩৮৩, পৃ. ১৪৭
৩. দাস, অমিতাভ, *আখ্যানতত্ত্ব,* দে'জ পাবলিশিং, ২০১৯, পৃ. ৮৬
৪. তদেব, পৃ. ৮৭
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *বিভূতি রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশারর্স, ১৩৬৩, পৃ. ৫
৬. তদেব, পৃ. ৯
৭. ঘড়াই, অনিল, *বক্ররেখা,* দে'জ পাবলিশিং, ১৪০০, পৃ. ১১
৮. তদেব, পৃ. ১৩
৯. ঘোষ, প্রসূন, *বাংলা উপন্যাসের বিবর্তন : আত্মকথনরীতির উপন্যাস,* আশাদীপ, ২০২২, পৃ. ৩২১
১০. তদেব, পৃ. ৫১
১১. বনফুল, *ডানা,* দে'জ পাবলিশিং, ১৯৪৮, পৃ. ৯
১২. চক্রবর্তী, অলোক, *আখ্যানের তত্ত্বভুবন,* আশাদীপ, ২০২১, পৃ. ৩৩৭
১৩. Stanzel, FK. *A Theory of Narrative.* Translated by Charlotte Goedsche, Cambridge University Press, 1988, p. 5
১৪. মিশ্র, ভগীরথ, *আড়কাঠি,* দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩, পৃ. ১৪৯